ইউনিট

২০

নির্বাচকমণ্ডলী ও নির্বাচন

ভূমিকা

বর্তমান যুগে রাষ্ট্রের বিশাল আয়তন ও অধিক জনসংখ্যার জন্য জনসাধারণ প্রত্যক্ষভাবে শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করতে পারে না। তাই তারা প্রতিনিধি নির্বাচনের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে সরকার পরিচালনায় অংশগ্রহণ করে। রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা জনসাধারণের উপর ন্যস্ত। জনসাধারণ ভোট দিয়ে প্রতিনিধি নির্বাচন করে সার্বভৌম ক্ষমতা ব্যবহার করে। নির্বাচিত প্রতিনিধি বা প্রতিনিধিবর্গ জনসাধারণের পক্ষে দেশের শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করে। সে কারণে গণতন্ত্রে নির্বাচন ও নির্বাচকমণ্ডলীর গুরুত্ব অনেক বেশি।

পাঠ ১ : নির্বাচন, নির্বাচনী এলাকা, নির্বাচন কমিশন, নির্বাচনী তফসিল, নির্বাচনী প্রক্রিয়া, ভোট ও ভোটাধিকার, ব্যালট পেপার বা নির্বাচনী পত্রী

উদ্দেশ্য : এই পাঠ শেষে আপনি–

- নির্বাচন কাকে বলে সে সম্বন্ধে বলতে পারবেন।
- নির্বাচনী এলাকা সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন।
- নির্বাচন কমিশন ও নির্বাচনী তফসিল সম্বন্ধে ব্যাখ্যা প্রদান করতে পারবেন।
- নির্বাচনী প্রক্রিয়া, নির্বাচনী প্রচার ও অংশগ্রহণ সম্পর্কে লিখতে পারবেন।
- ভোট ও ভোটাধিকার কি তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ব্যালট পেপার বা নির্বাচনী পত্রীর গুরুত্ব চিহ্নিত ও বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

২০.১.১ নির্বাচন কাকে বলে

যে পদ্ধতিতে জনসাধারণ প্রতিনিধি বাছাই করে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করতে পারে তাকে নির্বাচন বলা হয়। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় নির্বাচন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সরকার গঠনের জন্য বিভিন্ন স্তরে প্রতিনিধি বাছাইয়ের উদ্দেশ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনের মাধ্যমে জনমত প্রকাশ পায় এবং সরকার জনগণের চাহিদা অনুযায়ী শাসন সংক্রান্ত কর্মসূচি গ্রহণ করে। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জনে এবং অবাঞ্ছিত রাজনৈতিক দলের অবসান ঘটাতে নির্বাচনের গুরুত্ব অপরিসীম। নির্বাচনের কর্মতৎপরতায় বিভিন্ন দলের মধ্যে সমঝোতার সৃষ্টি হয় এবং সচেতন রাজনীতির বিকাশ ঘটে। নির্বাচন সরকার ও জনগণের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করে। সর্বোপরি নির্বাচনের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগ ঘটে এবং রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি পায়।

২০.১.২ নির্বাচনী এলাকা

নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য সমগ্র দেশকে কয়েকটি এলাকায় বিভক্ত করা হয়। এরূপ নির্দিষ্ট এলাকাকে নির্বাচনী এলাকা বলে। নির্বাচনী এলাকা নির্ধারণের ক্ষেত্রে সাধারণত যোগাযোগ, রাস্তাঘাট, ভৌগোলিক নৈকট্য ও জনসংখ্যাকে ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। সুতরাং এক বা একাধিক প্রতিনিধি নির্বাচনের উদ্দেশ্যে সুবিধা নীতির ভিত্তিতে সংগঠিত সুনির্দিষ্ট এলাকাকে নির্বাচনী এলাকা বলে।

২০.১.৩ নির্বাচন কমিশন

বাংলাদেশের নির্বাচন পরিচালনার জন্য একটি স্বতন্ত্র, নিরপেক্ষ ও স্বাধীন নির্বাচন কমিশন আছে। নির্বাচন কমিশন একজন প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও কয়েকজন নির্বাচন কমিশনার নিয়ে গঠিত। কমিশনারদের সংখ্যা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নির্ধারিত হয়ে থাকে। রাষ্ট্রপতি প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারদের নিযুক্ত করে থাকেন। নির্বাচন কমিশনের কার্যকাল পাঁচ বছর। নির্বাচন কমিশনারগণ রাষ্ট্রপতির নিকট স্বেচ্ছায় পদত্যাগপত্র পেশ করেন বা কোন অসদাচরণ বা অসামর্থ্যের কারণে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পেতে পারেন। প্রধান নির্বাচন কমিশনারের দায়িত্ব পালন করার পর কোন ব্যক্তি প্রজাতন্ত্রের কোন কর্মে নিয়োগ লাভ করতে পারেন না। তবে কোন নির্বাচন কমিশনার প্রধান নির্বাচন কমিশনারের দায়িত্ব পেতে পারেন।

২০.১.৪ নির্বাচনী তফসিল

নির্বাচনী তফসিল বলতে নির্বাচন সংক্রান্ত ঘোষণা ও নির্বাচন প্রক্রিয়ার সমুদয় নীতি ও বিধি–বিধানকে বুঝায়। অর্থাৎ নির্বাচন অনুষ্ঠানের তারিখ, মনোনয়নপত্র জমাদান, বাছাই, প্রত্যাহার, নির্বাচনে অংশ গ্রহণের যোগ্যতা, নির্বাচনী ইশতেহার ইত্যাদি সংক্রান্ত সময় ও নিয়মাবলীর সমষ্টিকে নির্বাচনী তফসিল বলে।

২০.১.৫ নির্বাচনী প্রক্রিয়া, নির্বাচনী প্রচার ও অংশগ্রহণ

যে পদ্ধতিতে নির্বাচন করা হয় তাকে নির্বাচনী প্রক্রিয়া বলে। নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য সম্পাদিত সকল কর্মকাণ্ড নির্বাচনী প্রক্রিয়ার আওতায় পড়ে।

নির্বাচনী প্রচারের বিষয়ে সুস্পষ্ট নীতিমালা রয়েছে। রাজনৈতিক দল বা প্রার্থীর জন্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক সুস্পষ্ট নির্দেশমালা জারি করা হয়ে থাকে। যেমন, প্রচারের ক্ষেত্রে প্রত্যেকেই সমান অধিকার ভোগ করবে। প্রতিপক্ষের কোন সভা, শোভাযাত্রা এবং অন্যান্য প্রচারাভিযানে বাধা প্রদান করা যাবে না ইত্যাদি।

নির্বাচনে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক সুস্থ নর-নারী সমান অধিকার ভোগ করবে। প্রার্থী হিসেবে বা ভোটার হিসেবে প্রত্যেকেই সমান অধিকার পাবে। তবে প্রার্থীকে কিছু শর্তাবলী পালন করতে হবে।

২০.১.৬ ভোট ও ভোটাধিকার

জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত হতে ইচ্ছুক প্রার্থীদের প্রতি সমর্থন যাচাইয়ের জন্য নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত ব্যবস্থাকে ভোট বলা হয়। রাষ্ট্রে নাগরিকগণ যে সমস্ত অধিকার ভোগ করে তার মধ্যে ভোটাধিকারই শ্রেষ্ঠ অধিকার। রাষ্ট্রের প্রচলিত আইনানুযায়ী যখন কোন নাগরিক ভোটদানের অধিকার লাভ করে তখন তাকে ভোটার বা নির্বাচক বলে। কোন ভোটার যখন প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য ভোটাধিকার প্রয়োগ করে তখন তাকে ভোটদান করা বলে।

২০.১.৭ ব্যালট পেপার বা নির্বাচনপত্রী

প্রতিনিধি নির্বাচনের উদ্দেশ্যে অতি গোপনীয়ভাবে ভোটদানের ব্যবস্থা হিসেবে যে মুদ্রিত কাগজ বা পত্রী ব্যবহার করা হয় তাকে ব্যালট পেপার বা নির্বাচনপত্রী বলে। নির্বাচনপত্রীতে ভোটারগণ কাকে পছন্দ করেন তা নির্ধারণের জন্য প্রার্থীর নাম ও প্রতীক বরাবর স্পষ্টভাবে নির্ধারিত চিহ্ন এঁকে দেন। অনেক ক্ষেত্রে ব্যালট পেপার অলিখিত থাকে। সে ক্ষেত্রে ভোটারগণ তাদের ব্যালট পেপার পছন্দকৃত প্রার্থীর বাক্সের ভিতর ফেলে ভোট দান করেন।

সার-সংক্ষেপ

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস এবং সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। জনসাধারণ ভোট দিয়ে প্রতিনিধি নির্বাচন করে সার্বভৌম ক্ষমতা ব্যবহার করে। তাই আধুনিক প্রতিনিধিত্বশীল শাসন ব্যবস্থায় নির্বাচকমণ্ডলীর গুরুত্ব অপরিসীম। নাগরিকগণ যখন রাষ্ট্রের আইনানুযায়ী ভোট দানের ক্ষমতা লাভ করেন তখন তাকে নির্বাচক বা ভোটার বলে। প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য যখন নাগরিকগণ ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন তখন তাকে ভোটদান করা বলে। রাষ্ট্রের আইন অনুযায়ী যে সকল নাগরিক প্রতিনিধি নির্বাচনের অধিকার লাভ করে তাদেরকে সমষ্টিগতভাবে নির্বাচকমণ্ডলী বলে। নির্বাচনের প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে নির্বাচনী তফসিল। আর এই নির্বাচন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী পরিচালনা করে নির্বাচন কমিশন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন– ১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। ব্যালট পেপার কাকে বলে ?

ক. নির্বাচনের জন্য মনোনীত প্রার্থীরা ভোটারদেরকে যেসব কাগজপত্র দেন তাকে

খ. নাগরিকগণ যে সমস্ত রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করে তা যে দলিলে লিপিবদ্ধ থাকে তাকে

গ. প্রতিনিধি বাছাইয়ের উদ্দেশ্যে গোপনভাবে ভোটদানের জন্য যে কাগজ ব্যবহার করা হয় তাকে

ঘ. নির্বাচন কর্মকর্তা যে ঘোষণাপত্রের মাধ্যমে ফলাফল প্রকাশ করেন তাকে

২। নির্বাচন কমিশনের কার্যকাল কত বছর ?

ক. ৩ বছর খ. ৫ বছর

গ. ৬ বছর ঘ. ১০ বছর

৩। নির্বাচনী তফসিল কি ?

ক. যে পদ্ধতিতে নির্বাচনী ফলাফল ঘোষণা করা হয়

খ. যে তফসিলের মাধ্যমে জনগণ প্রতিনিধি বাছাই করে

গ. নির্বাচনের নিয়ম-কানুন যে ঘোষণাপত্রে লিপিবদ্ধ থাকে

ঘ. নির্বাচন কমিশন যে ঘোষণার মাধ্যমে প্রার্থীকে জয়ী ঘোষণা করে

পাঠ ২ : নির্বাচকমণ্ডলীর গুরুত্ব ও কার্যাবলী, ভোটাধিকারের ভিত্তি, সীমিত ভোটাধিকার, সার্বজনীন প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকার

উদ্দেশ্য : এই পাঠ শেষে আপনি–

- নির্বাচকমণ্ডলীর সংজ্ঞা, গুরুত্ব ও কার্যাবলী লিখতে পারবেন।
- ভোটাধিকারের ভিত্তি – সীমিত ভোটাধিকার ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- সম্পত্তি ভিত্তিক ভোটাধিকার সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন।
- নারী ভোটাধিকার, সার্বজনীন প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকার– অর্থ এবং পক্ষে-বিপক্ষে যুক্তি ব্যাখ্যা ও প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করতে পারবেন।

২০.২.১ নির্বাচকমণ্ডলী কাকে বলে

রাষ্ট্রে আইনগতভাবে ভোটাধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গের সমষ্টিকে নির্বাচকমণ্ডলী বলে। গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় জনগণ তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে জনপ্রতিনিধি নির্বাচন করে। নির্বাচনে যিনি ভোটদানের ক্ষমতা প্রয়োগ করেন তাকে নির্বাচক বলে। আর সকল ভোট দাতাকে সমষ্টিগতভাবে নির্বাচকমণ্ডলী বলা হয়। উম্মাদ, দেউলিয়া এবং আইন দ্বারা ভোটদানের অযোগ্য ঘোষিত নরনারী ছাড়া সকল প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি ভোটদানের অধিকারপ্রাপ্ত। বাংলাদেশে ১৮ বছরের অধিক বয়সের সকল নরনারীকে ভোটদানের অধিকার দেওয়া হয়েছে। তারা সবাই নির্বাচক মণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত।

২০.২.২ নির্বাচকমণ্ডলীর গুরুত্ব ও কার্যাবলী

গণতন্ত্রে জনগণই সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। ভোটদান ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে জনগণ তাদের সার্বভৌম ক্ষমতা কার্যকরী করে। সার্বভৌম ক্ষমতা নির্বাচকমণ্ডলীর হাতে ন্যস্ত থাকে। সুতরাং, গণতন্ত্রে নির্বাচকমণ্ডলীর ভূমিকা ও গুরুত্ব অপরিসীম। নিম্নে নির্বাচকমণ্ডলীর ভূমিকা ও কার্যাবলী আলোচনা করা হল :

(ক) নির্বাচকমণ্ডলীর ভূমিকা– পরোক্ষ গণতন্ত্রে নির্বাচকমণ্ডলী বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নির্বাচকমন্ডলী আইন সভার সদস্য, রাষ্ট্র প্রধান এবং আঞ্চলিক সরকারের প্রতিনিধিদের নির্বাচন করে। সুতরাং সরকার গঠন ও পরিচালনার ক্ষেত্রে নির্বাচকমণ্ডলী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শুধু সরকার গঠন ও পরিচালনা নয়, বরং আইন প্রণয়ন ও রদবদল, সংবিধান প্রণয়ন ও সংশোধন এবং নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দায়িত্বশীল রাখার ব্যাপারে নির্বাচকমণ্ডলী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিসমূহ, যথা– গণউদ্যোগ, গণনির্দেশ ও পদচ্যুতির মাধ্যমে নির্বাচকমণ্ডলী প্রশাসনিক ব্যবস্থায় অংশগ্রহণ করে। নির্বাচকমণ্ডলীর এই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার জন্য একে সরকারের একটি স্বতন্ত্র অংশ মনে করা হয়। নির্বাচকমণ্ডলীর ভূমিকা শুধুমাত্র সরকার গঠন, পরোক্ষভাবে সরকার পরিচালনা, আইন প্রণয়ন, আইনের রদবদল এবং সংবিধান প্রণয়ন ও সংশোধনের মধ্যে সীমিত নয় বরং সরকারের নীতি নির্ধারণের উপরও এটি প্রভূত প্রভাব বিস্তার করে। সরকার নির্বাচকমণ্ডলীর মতের প্রতি লক্ষ্য রেখে তার নীতি নির্ধারণ করে। তাছাড়া এটি সরকারকে সঠিক পথে পরিচালনা করতে প্রয়াস পায়। সরকার নির্বাচকমণ্ডলীর মতামতের প্রতি সংবেদনশীল থাকে। কারণ সরকার বিপথগামী হলে, দুর্নীতিতে লিপ্ত হলে নির্বাচকমণ্ডলীর সমর্থন হারায়। পরবর্তী নির্বাচনে সমর্থন লাভ করতে ব্যর্থ হয়। অন্য কথায়, নির্বাচকমণ্ডলী স্বৈরাচারী ও দুর্নীতিবাজ সরকারের অবসান ঘটায়।

(খ) নির্বাচকমণ্ডলীর কার্যাবলী– নির্বাচকমণ্ডলীর কার্যাবলী নিচে বর্ণনা করা হল :

(১) প্রতিনিধি নির্বাচন করা– নির্বাচকমণ্ডলীর প্রধান কাজ হল সরকার পরিচালনার জন্য প্রতিনিধি নির্বাচন করা। মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারে নির্বাচকমন্ডলী আইনসভার সদস্যদেরকে নির্বাচিত করে। যারা আইন সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়, তাদের দ্বারা সরকার গঠিত হয়। অপরদিকে, রাষ্ট্রপতি শাসিত

সরকারে রাষ্ট্রপ্রধান জনগণের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন। এভাবে নির্বাচকমণ্ডলী সরকার পরিচালনার জন্য প্রতিনিধি নির্বাচন করে।

(২) সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করা – প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রে নির্বাচকমণ্ডলী সরকারকে বিভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। এসব পদ্ধতিগুলোর মধ্যে গণনির্দেশ, গণউদ্যোগ, গণভোট, পদচ্যুতি ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

(৩) বিচারক নিয়োগ– মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিচারকগণ নির্বাচকমণ্ডলীর দ্বারা নির্বাচিত হন।

(৪) গণতন্ত্রের সার্থক রূপায়ণ ঘটানো– নির্বাচকমণ্ডলী সরকারের জনস্বার্থ বিরোধী কার্যক্রমের সমালোচনা করে বলে সরকার স্বেচ্ছাচারী হতে পারে না। এটা সরকারের ক্ষমতার উপর বিধিনিষেধ আরোপ করে সরকারের ক্ষমতাকে সীমিত করে। নির্বাচকমণ্ডলী গণতন্ত্রের সঠিক বিকাশের পথে খুবই সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

(৫) সরকারকে সহায়তা দান করা– কোন জটিল রাজনৈতিক সমস্যার সমাধানকল্পে মতামত প্রকাশ করে নির্বাচকমণ্ডলী প্রয়োজনমত সরকারকে সহায়তা দান করে।

(৬) সরকার পরিবর্তন করা– জনপ্রতিনিধিরা জনস্বার্থের পক্ষে কাজ করছে কি-না, নির্বাচকমণ্ডলী সেদিকে লক্ষ্য রাখে। জনস্বার্থের বিরোধী কাজ করলে নির্বাচকমণ্ডলী পরবর্তী নির্বাচনে সরকার পরিবর্তনের জন্য নতুন প্রতিনিধি নির্বাচন করতে পারে। এজন্য ক্ষমতাসীন সরকার নির্বাচকমণ্ডলীর মর্জি-মাফিক নীতি কার্যকর করে থাকে।

(৭) সরকারের অপরিহার্য অঙ্গ– নির্বাচকমণ্ডলী সরকারের সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করে বলে কোন কোন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী নির্বাচকমণ্ডলীকে সরকারের চতুর্থ বিভাগ হিসেবে আখ্যায়িত করেন।

২০.২.৩ ভোটাধিকারের ভিত্তি

ভোটাধিকার নাগরিকদের শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক অধিকার। কিন্তু এই অধিকার নির্ধারণ করা আধুনিককালের একটি জটিল সমস্যা। ভোটাধিকারের ভিত্তি বা শর্ত হল বয়স, নারী-পুরুষ, সম্পত্তি, বাসস্থান, শিক্ষা, মানসিক ও নৈতিক অবস্থা ইত্যাদি। কোন কোন দেশে নারীদের ভোটাধিকার দেওয়া হয় না। আবার কোন কোন দেশে সম্পত্তিকে ভোটাধিকারের ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কিন্তু এ ধরনের দেশের সংখ্যা খুবই কম। বর্তমানে প্রত্যেক দেশে নাবালক, অপ্রাপ্ত বয়স্ক, উম্মাদ, দেউলিয়া ও রাষ্ট্রদ্রোহী ব্যক্তিকে ভোটদানের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়। কারণ তারা ভোটাধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে যথাযথ বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করতে পারে না, কিংবা বিচার বিবেচনার মাধ্যমে ভোট দিতে পারে না। ভোটাধিকার একটি পবিত্র রাজনৈতিক অধিকার। এই অধিকারের যথেচ্ছাচার ও খেয়ালীপূর্ণ প্রয়োগ যাতে না হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে অনুপযুক্তদের ভোটদানের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়।

২০.২.৪ সীমিত ভোটাধিকার

যখন কোন রাষ্ট্রে বিশেষ যোগ্যতার ভিত্তিতে ভোটাধিকার দেওয়ার ফলে অধিকাংশ লোক ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত হয় তখন এই ব্যবস্থাকে সীমিত ভোটাধিকার বলে।

এক পক্ষের মতে, সকলকে ভোটাধিকার দেওয়ার অর্থ যথেচ্ছাচারের স্বীকৃতি দেওয়া। কারণ অশিক্ষিত, বিত্তহীন ও নারীজাতি ভোটদানের ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করতে পারে না। অন্যপক্ষের মতে, সীমিত ভোটাধিকার গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ শিক্ষা ও সম্পত্তি রাষ্ট্রের আনুকূল্যে লাভ করা যায়। সুতরাং রাষ্ট্রের অযোগ্যতার জন্য ব্যক্তিকে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করা উচিত নয়। নারীদের সম্পর্কে অযোগ্যতার যুক্তি গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ বর্তমানকালে এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, নারীরা রাষ্ট্র পরিচালনায় পুরুষদের সমকক্ষ। সুতরাং সীমিত ভোটাধিকার কোন সুস্থ ও বিবেক সম্পন্ন সমাজের নির্বাচন ব্যবস্থা হতে পারে না বা হওয়া উচিত নয়।

২০.২.৫ সম্পত্তিভিত্তিক ভোটাধিকার

যে ব্যবস্থায় সম্পত্তির ভিত্তিতে ভোটাধিকার নির্ণয় করা হয় তাকে সম্পত্তি ভিত্তিক ভোটাধিকার বলে। এ ব্যবস্থায় সমাজের অধিকাংশ মানুষ, ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। এই ব্যবস্থায় শুধু কর প্রদানের ক্ষমতা সম্পন্ন ব্যক্তিরাই ভোটাধিকার পেয়ে থাকেন।

২০.২.৬ নারীর ভোটাধিকার

নারীদের ভোটদানের অধিকারকে নারী ভোটাধিকার বলে। শিল্পভিত্তিক অর্থনীতি, গণতন্ত্রের বিকাশ ও শিক্ষার প্রসারের সাথে সাথে ভোটাধিকারের ভিত্তি প্রসার লাভ করেছে। এর ফলে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে নারী ভোটাধিকারের প্রশ্নটি বেশ গুরুত্ব সহকারে দেখা দেয়। বিংশ শতাব্দীতে বেশ কতকগুলো রাষ্ট্র নারীদের ভোটাধিকার দান করেছে। বর্তমানে অল্প কয়েকটি রাষ্ট্র ছাড়া প্রায় সব রাষ্ট্রই নারীদের ভোটাধিকার দান করেছে। যুক্তরাজ্যে ১৯১৮ সনে নারী ভোটাধিকার স্বীকৃত হয়। ফ্রান্সে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে নারী ভোটাধিকার স্বীকৃতি পায়। সুইজারল্যান্ডে ১৯৭১ সনে নারী ভোটাধিকার স্বীকৃতি লাভ করেছে। কিন্তু মধ্যপ্রাচ্যের কতকগুলো মুসলিম রাষ্ট্রে এখনও নারী ভোটাধিকার স্বীকৃতি পায় নি।

২০.২.৭ সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার

যখন জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ধনী, দরিদ্র, নারী ও পুরুষ নির্বিশেষে প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক নর-নারীকে ভোটাধিকার দেওয়া হয় তখন তাকে সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকার বলা হয়। বাংলাদেশে ১৮ বছর এবং তদুর্ধ বয়সের ব্যক্তিকে প্রাপ্তবয়স্ক ধরা হয়। তবে উম্মাদ, দেউলিয়া ও অপ্রাপ্তবয়স্ক এবং গুরুতর অপরাধের জন্য আদালতে দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে ভোটাধিকার দেওয়া হয় না। সুতরাং উম্মাদ, দেউলিয়া, অপ্রাপ্তবয়স্ক, আদালতে শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ ব্যতীত প্রাপ্তবয়স্ক সকল জনসাধারণের ভোটাধিকারকে সার্বজনীন ভোটাধিকার বলা হয়।

সার্বজনীন প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকারের পক্ষে যুক্তি

(১) গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও আদর্শের পরিপূরক– গণতন্ত্র জনগণের সরকার। সার্বজনীন ভোটাধিকারের ফলে সরকার জনমতের ভিত্তিতে গড়ে উঠে এবং জনমত দ্বারা পরিচালিত হয়।

(২) সাম্য ও স্বাধীনতার পরিপূরক– রাষ্ট্রের সকল নাগরিক সমান অধিকারের দাবীদার। সার্বজনীন ভোটাধিকার সকলকে সমান রাজনৈতিক অধিকার দান করে। এই নীতি ব্যক্তিস্বাধীনতার রক্ষাকবচ। জনসাধারণের ভোটাধিকার শাসকের স্বেচ্ছাচারী হওয়ার প্রবণতাকে প্রতিরোধ করে এবং ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষা করে।

(৩) গণসার্বভৌমত্ব প্রকাশের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম– রুশো বলেন, "জনসাধারণই সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী"। জনগণই সরকারের ক্ষমতার উৎস। সার্বজনীন ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে জনসাধারণ সরকার গঠন ও অবাঞ্ছিত সরকারের পতন ঘটিয়ে সার্বভৌম ক্ষমতার প্রকাশ ঘটাতে পারে।

(৪) ব্যক্তিত্ব বিকাশের সহায়ক– ভোটাধিকারের ফলে জনসাধারণ রাজনৈতিক দিক দিয়ে সচেতন হয় এবং নিজের গুরুত্ব ও মর্যাদা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী লর্ড ব্রাইস বলেন, "ভোটাধিকারের মাধ্যমে মানুষ ব্যক্তিত্ব ও মর্যাদাসম্পন্ন হয়।"

(৫) ন্যায়সঙ্গত ও যুক্তিযুক্ত– রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থা সকলকে স্পর্শ করে। "যা সকলের জন্য, তা সকলের দ্বারাই নির্ণীত হওয়া উচিত।" সুতরাং সার্বজনীন ভোটাধিকার ন্যায়সঙ্গত ও যুক্তিযুক্ত।

(৬) সার্বজনীন ভোটাধিকার অস্বীকার করা অন্যায় ও অসঙ্গত– মিল বলেন, "যারা ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত হয়, তারা রাষ্ট্র সম্পর্কে উদাসীন হয়।" সুতরাং রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে সকল নাগরিককে সজাগ ও সচেতন করে তুলতে সার্বজনীন ভোটাধিকার অপরিহার্য।

সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের বিপক্ষে যুক্তিসমূহ :

(১) ভোটাধিকারের অন্যতম শর্ত যোগ্যতা– অধ্যাপক লেকী, হেনরী মেইন, প্রমুখ চিন্তানায়ক সার্বজনীন ভোটাধিকারের বিপক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। তাঁদের মতে, ভোটাধিকার কোন জন্মগত অধিকার নয়। এর জন্য যোগ্যতা অর্জন করতে হয়। যারা ভোটক্ষমতা যথাযথভাবে প্রয়োগ করতে পারে না তাদের ভোটাধিকার থাকা উচিত নয়।

(২) সম্পদহীনদের ভোটাধিকার থাকা উচিত নয়– সম্পদহীনদের ভোটাধিকার দেওয়া উচিত নয়। কারণ, তারা সরকারি অর্থ ব্যয়ের দায়িত্ব পেলে মিতব্যয়ী হবে না। তারা সরকারি অর্থের অপচয় করবে। লেকী বলেছেন, "আইন পরিষদ প্রধানত কর ধার্যের একটি বিভাগ।" সুতরাং যারা কর প্রদান করে, এর প্রতিনিধি নির্বাচনের ভার মুখ্যত তাদের উপর থাকা উচিত।

(৩) যোগ্যতম ব্যক্তির একাধিক ভোট থাকা প্রয়োজন– সার্বজনীন ভোটাধিকার নারী-পুরুষ, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সবাইকে ভোটদানে সমান যোগ্যতাসম্পন্ন মনে করে। কিন্তু, মানুষ কখনও যোগ্যতার দিক দিয়ে সমান নয়। জ্ঞান-বুদ্ধি ও প্রজ্ঞার দিক দিয়ে মানুষ অসমান। তাই, যাঁদের বেশি যোগ্যতা আছে তাঁরা অধিক ভোটাধিকারের দাবীদার হতে পারেন।

(৪) নারীরা শারীরিক দিক দিয়ে পুরুষের সমান নয়– অনেকে নারীদের ভোটাধিকার অস্বীকার করেন। তাঁরা মনে করেন, যেহেতু নারীরা শারীরিকভাবে দুর্বল এবং পুরুষের সমানভাবে রাষ্ট্রীয় কার্যে অংশগ্রহণ করতে পারে না, সেহেতু তাদের ভোটাধিকার থাকা উচিত নয়। কিন্তু, এই যুক্তি বর্তমান কালে অচল। নারীরা এখন বিভিন্ন কাজে পারদর্শিতার পরিচয় দিচ্ছে।

(৫) জনসাধারণ যোগ্য ব্যক্তিদের নির্বাচন করতে অক্ষম– সার্বজনীন ভোটাধিকারের বিপক্ষে আরও যুক্তি হচ্ছে যে, জনসাধারণ জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তিদের নির্বাচন করতে পারে না। তারা বক্তৃতাবাগীশ ব্যক্তিদের নির্বাচন করে। এ কারণে সার্বজনীন ভোটাধিকারের ফলে যোগ্যতম সরকার গঠন হয় না।

(৬) রাজনীতির মান নিু হয়– সার্বজনীন ভোটাধিকারের ফলে রাজনীতির মান নিম্ন হয়। কারণ পেশীশক্তির অধিকারী ও বক্তৃতাবাগীশ নেতারা দলীয় সংগঠনের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং নির্বাচনে নেতৃত্ব দেয়। ফলে কোন্দল, কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি, ব্যক্তিগত আক্রমণ প্রভৃতি নির্বাচনী প্রচারণার বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়ায়।

সার্বজনীন ভোটাধিকারের বিপক্ষে যুক্তিগুলো খুবই দুর্বল। তাই দেখা যায় প্রত্যেক দেশে সার্বজনীন ভোটাধিকারের নীতি স্বীকৃত হয়েছে।

সার-সংক্ষেপ

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নির্বাচন এবং নির্বাচকমণ্ডলীর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গণতন্ত্র জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠিত করে। নির্বাচকমণ্ডলী ভোট দিয়ে আইন পরিষদের সদস্য এবং রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচন করে। সুতরাং ভোটদানের মাধ্যমে সরকারকে পরিচালনা করে। সরকারের সমালোচনা, আইন পরিষদের কাছে চিঠি ও টেলিগ্রাম প্রেরণ প্রভৃতির মাধ্যমে নির্বাচকমণ্ডলী সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করে। নির্বাচকমন্ডলী প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিসমূহের মাধ্যমে আইন প্রণয়ন ও সংবিধান সংশোধনে অংশগ্রহণ করে, সরকারি নীতির সমর্থন দান বা বিরোধিতা করে এবং নির্বাচিত সদস্যদের পদচ্যুত করে সরকার পরিচালনায় অংশগ্রহণ করে এবং সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করতে প্রয়াস পায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন– ২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। বাংলাদেশে একজন নারী বা পুরুষ কত বছর বয়সে ভোটার হতে পারে ?

ক. ২০ খ. ১৬

গ. ২১ ঘ. ১৮

২। সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকার বলতে কি বুঝায় ?

ক. নারী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার।

খ. শুধুমাত্র নারীদের ভোটাধিকার।

গ. কেবলমাত্র পুরুষদের ভোটাধিকার।

ঘ. ১৪ বছরের ঊর্ধ্বে সকল নাগরিকের ভোটাধিকার।

৩। সার্বজনীন ভোটাধিকারের পক্ষের যুক্তি কোনটি ?

ক. সম্পদহীনদের ভোটাধিকার না থাকা

খ. যোগ্য ব্যক্তিদের একাধিক ভোট থাকা

গ. দেউলিয়াদের ভোটাধিকার থাকা

ঘ. সাম্য ও স্বাধীনতার পরিপূরক

পাঠ ৩ : প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নির্বাচনের দোষগুণ, ভোটদান পদ্ধতি– প্রকাশ্য ও গোপন

উদ্দেশ্য : এই পাঠ শেষে আপনি–

- প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নির্বাচন কি তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- প্রত্যক্ষ নির্বাচনের গুণ-দোষ লিখতে পারবেন।
- পরোক্ষ নির্বাচনের গুণ-দোষ বর্ণনা করতে পারবেন।
- ভোটদান পদ্ধতি– প্রকাশ্য ও গোপন পদ্ধতি সম্বন্ধে বলতে ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

২০.৩.১ প্রত্যক্ষ নির্বাচন

যে নির্বাচন ব্যবস্থায় ভোটারগণ সরাসরিভাবে ভোট দিয়ে প্রতিনিধি নির্বাচন করতে পারে তাকে প্রত্যক্ষ নির্বাচন বলা হয়। এ নির্বাচন পদ্ধতিতে প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য একবার মাত্র ভোট হয়। এতে আইন পরিষদের সদস্যবৃন্দ, রাষ্ট্রপতি এবং উপ-রাষ্ট্রপতিগণ ভোটারদের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হতে পারেন।

২০.৩.২ পরোক্ষ নির্বাচন

যে নির্বাচন পদ্ধতিতে জনসাধারণ সরাসরিভাবে প্রতিনিধি নির্বাচন না করে একদল মাধ্যমিক নির্বাচনী সংস্থার সদস্যদের নির্বাচন করে এবং মাধ্যমিক নির্বাচনী সংস্থার সদস্যবৃন্দ পর্যায়ক্রমে চূড়ান্ত প্রতিনিধি নির্বাচন করে তাকে পরোক্ষ নির্বাচন বলা হয়। এই পদ্ধতিতে নির্বাচন হয় দু'বার। প্রথমবার সাধারণ ভোটারগণ ভোট দিয়ে মাধ্যমিক নির্বাচনী সংস্থার সদস্যদেরকে নির্বাচন করে। দ্বিতীয়বার মাধ্যমিক নির্বাচনী সংস্থার সদস্যবৃন্দ ভোট দিয়ে চূড়ান্ত প্রতিনিধিদের নির্বাচন করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি ও উপ-রাষ্ট্রপতি এ পদ্ধতিতে নির্বাচিত হয়।

২০.৩.৩ প্রত্যক্ষ নির্বাচনের গুণ ও দোষ

(ক) প্রত্যক্ষ নির্বাচনের গুণ– এই ব্যবস্থার গুণাবলি নিম্নরূপ

(১) জনপ্রিয়– প্রত্যক্ষ নির্বাচন অধিক গণতান্ত্রিক। কারণ নির্বাচকমণ্ডলী কোন মাধ্যম ছাড়াই সরাসরিভাবে তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করতে পারে। প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে প্রতিনিধিগণ সরাসরিভাবে নির্বাচিত হন। তাই এ ব্যবস্থা অধিকতর জনপ্রিয়।

(২) নির্বাচকমণ্ডলীর প্রত্যক্ষ প্রভাব– প্রত্যক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থায় নির্বাচকমণ্ডলীর প্রত্যক্ষ প্রভাব থাকে। প্রতিনিধিগণ সব সময়ে নির্বাচকমণ্ডলীর মতামত অনুসারে আইন প্রণয়ন ও শাসন কার্য পরিচালনা করে। যদি তাদের কার্যাবলী পছন্দ না হয় তাহলে নির্বাচকমণ্ডলী তাদের উপর বিভিন্নভাবে প্রভাব বিস্ত ার করতে পারে এবং সে প্রভাবের চাপে তারা নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়।

(৩) দুর্নীতির সম্ভাবনা কম– প্রত্যক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থা প্রচলিত থাকলে ভোটারের সংখ্যা অধিক থাকে। ফলে, কোন ব্যক্তি এত অধিক সংখ্যক লোককে প্রলোভন দিয়ে বা কোন প্রকার অবৈধ সুযোগ সুবিধা প্রদান করে নিজের বা দলের অনুকূলে সমর্থন আদায় করতে পারে না। এ ক্ষেত্রে দুর্নীতির সম্ভাবনা কম থাকে। ভোটারের সংখ্যা কম হলে দুর্নীতির পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।

(৪) রাজনৈতিক শিক্ষা লাভ– প্রত্যক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থা প্রচলিত থাকলে জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক শিক্ষা ও চেতনাবোধ প্রবল হয়। জনগণ অধিক মাত্রায় সরকারি ক্রিয়াকর্মে অংশগ্রহণ করতে আগ্রহ প্রকাশ করে।

(খ) প্রত্যক্ষ নির্বাচনের দোষ– এই ব্যবস্থার ত্রুটিসমূহ নিম্নে বর্ণনা করা হল

(১) রাজনৈতিক দলের প্রভাব– প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র প্রবর্তিত হলে রাজনৈতিক দলের প্রচারণা বৃদ্ধি পায়। বিভিন্ন দল বিভিন্ন প্রকার বক্তব্যের ঝুড়ি নিয়ে জনসাধারণের সামনে হাজির হয়। বিভিন্ন নীতি ও আদর্শের বুলির মধ্যে ভোটারগণ তাদের নিজস্ব চিন্তাভাবনা হারিয়ে ফেলে।

(২) যোগ্য প্রতিনিধি নির্বাচনের অসুবিধা– প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে উপযুক্ত প্রতিনিধি নির্বাচন করা সম্ভব হয় না। অধিকাংশ ভোটারই হয় অজ্ঞ, নয় অনভিজ্ঞ। তারা যোগ্য প্রার্থী পছন্দ করতে পারে না। তাছাড়া সকলের কাছে প্রার্থীর পরিচিতিও থাকে না।

(৩) সুচতুর ব্যক্তির নেতৃত্ব– জনসাধারণকে নিজের অনুকূলে আনয়নের জন্য সুচতুর ও চটুল বক্তাগণ উত্তেজনাকর বক্তব্য দিয়ে থাকে। সাধারণ ও অশিক্ষিত ভোটারগণ এ ক্ষেত্রে অনলবর্ষী বক্তাদের বক্তব্যে প্রভাবিত হয়ে তাদেরকেই ভোট প্রদান করে।

(৪) দলীয় কোন্দল– প্রত্যক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সৃষ্টি হয় এবং রাজনৈতিক তৎপরতাও সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পায়। ফলে রাজনৈতিক দলে অশুভ উত্তেজনা বিরাজ করে।

২০.৩.৪ পরোক্ষ নির্বাচনের গুণ ও দোষ

(ক) পরোক্ষ নির্বাচনের গুণ– এই ব্যবস্থার গুণাবলি নিম্নে বর্ণনা করা হল :

(১) উপযুক্ত প্রতিনিধি নির্বাচিত করার সুবিধা– পরোক্ষ নির্বাচনে প্রাথমিক ভোটারদের বাছাই করা যোগ্য ভোটার নিয়ে মধ্যবর্তী নির্বাচনী সংস্থা গঠিত হয় এবং তারা অপেক্ষাকৃত শিক্ষিত, অভিজ্ঞ ও রাজনীতি সচেতন বলে যোগ্য প্রতিনিধি নির্বাচনে সক্ষম হয়। এই পদ্ধতিতে দু'দফায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় বলে অধিক বিচার বিবেচনার অবকাশ পাওয়া যায়।

(২) আবেগ বিবর্জিত নির্বাচন– পরোক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থা প্রত্যক্ষ নির্বাচনের অশুভ উত্তেজনা ও আবেগ হতে মুক্ত থেকে নির্বাচন অনুষ্ঠানে সহায়তা করে এবং নির্বাচনকে যুক্তির ভিত্তিতে পরিচালনা করে।

(৩) রাজনৈতিক দলের ধোকাবাজির অবকাশ থাকে না– এই ব্যবস্থায় নির্বাচনী সংস্থার সদস্যগণ ধীরস্থিরভাবে প্রার্থীর গুণাগুণ বিচার করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ফলে রাজনৈতিক দলের পক্ষে অযথা বাড়াবাড়ি বা ধোকাবাজি করে নির্বাচনী সুবিধা পাওয়া সম্ভব হয় না।

(খ) পরোক্ষ নির্বাচনের দোষ– এই ব্যবস্থার ত্রুটিসমূহ নিম্নরূপ

(১) পরোক্ষ নির্বাচন গণতন্ত্র বিরোধী– রাষ্ট্রপ্রধান অথবা জনপ্রতিনিধিগণ মধ্যবর্তী সংস্থা দ্বারা নির্বাচিত হয় বলে জনসাধারণের সঙ্গে তাদের কোন সংযোগ থাকে না, তারা জনসাধারণের নিকট দায়ীও থাকে না। এতে জনস্বার্থ বিরোধী কার্যকলাপের সম্ভাবনা থাকে।

(২) রাজনৈতিক শিক্ষা ও সচেতনতার শূন্যতা সৃষ্টি হয়– জনসাধারণ প্রাথমিক ভোটার হিসেবে মধ্যবর্তী সংস্থার উর্ধ্বে চিন্তা করতে পারে না। তাছাড়া সরাসরি রাষ্ট্রপ্রধান অথবা প্রতিনিধি নির্বাচন করতে না পারায় জনগণ রাজনীতিতে অংশগ্রহণের উৎসাহ হারিয়ে ফেলে। ফলে রাজনৈতিক শিক্ষা ও সচেতনতার শূন্যতা ঘটে।

(৩) দলীয় ব্যবস্থায় পরোক্ষ নির্বাচন অসার ও অযৌক্তিক– যে দেশে দল ব্যবস্থা সুসংগঠিত সেখানে প্রাথমিক ভোটারগণ দলীয় মনোভাবের ভিত্তিতেই নির্বাচনী সংস্থার সদস্যদের নির্বাচন করে এবং নির্বাচকমণ্ডলীর সদস্যগণও পরবর্তী নির্বাচনে দলীয় প্রার্থীকে ভোটদান করে। উদাহরণ স্বরূপ– মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি ও উপ-রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের উদ্দেশ্যে যখন নির্বাচনী সংস্থা নির্বাচিত হয়, তখনই অনানুষ্ঠানিকভাবে পরবর্তী রাষ্ট্রপতি ও উপ-রাষ্ট্রপতির নাম ঘোষণা করা হয়। পরে নির্বাচন হলে একই ফলাফল পাওয়া যায়।

(৪) দুর্নীতির সহায়ক– পরোক্ষ নির্বাচন পদ্ধতিতে অল্প সংখ্যক সদস্য নিয়ে গঠিত নির্বাচনী সংস্থার সদস্যদেরকে অতি সহজে অর্থ ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে প্রভাবিত করা যায়। তাই এতে দুর্নীতির সম্ভাবনা বেশি থাকে।

২০.৩.৫ ভোটদান পদ্ধতি– প্রকাশ্য ও গোপন

ভোটাধিকার একটি পবিত্র রাজনৈতিক অধিকার। ভোটদান পদ্ধতির উপর ভোটাধিকারের পবিত্রতা ও তাৎপর্য নির্ভরশীল। ভোটদানের পদ্ধতি দু'টি– (ক) প্রকাশ্য ভোটদান ও (খ) গোপন ভোটদান।

(ক) প্রকাশ্য ভোটদান– প্রকাশ্য ভোটদান পদ্ধতি বলতে সেই পদ্ধতিকেই বুঝায় যেখানে প্রত্যেক ভোটদাতা সকলের সম্মুখে প্রকাশ্যভাবে নিজ নিজ মনোনীত প্রার্থীকে ভোটদান করে। প্রকাশ্য ভোটদান "ধ্বনি" দ্বারা বা "হাত তুলে" সমর্থন দানের মাধ্যমে দেওয়া হয়। পাকিস্তানের স্থানীয় সরকার গঠনের ব্যাপারে এই পদ্ধতি কিছুদিন প্রয়োগ করা হয়েছিল। প্রাচীনকালে প্রকাশ্য ভোটদান পদ্ধতি চালু ছিল।

(খ) গোপন ভোটদান– গোপন ভোটদান বলতে সেই পদ্ধতিকে বুঝায়, যে পদ্ধতি মোতাবেক ভোটদাতাগণ গোপনে ব্যালটপত্রে পছন্দকৃত প্রার্থীর নামের পার্শ্বে নির্ধারিত চিহ্ন একে দিয়ে ভোটদান করতে পারে। আর যখন ব্যালট পেপারে ভোটারের নাম পরিচয় থাকে না, তখন ভোটারগণ সকলের অলক্ষ্যে প্রার্থীর নাম ও প্রতীক অঙ্কিত সীলমোহরকৃত বাক্সের মধ্যে ব্যালট পেপার ফেলে তাদের পছন্দসই প্রার্থীকে ভোট দিতে পারে।

সার-সংক্ষেপ

জনগণ ক্ষমতার উৎস। নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণ এই ক্ষমতা প্রয়োগ করে থাকে। নির্বাচন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যেকোনো ধরনের হতে পারে। প্রত্যক্ষ নির্বাচনে জনসাধারণ সরাসরি ভোট দিয়ে প্রার্থী নির্বাচন করে থাকে। পরোক্ষ নির্বাচনে জনসাধারণ ভোট দিয়ে একদল মাধ্যমিক নির্বাচনী সংস্থার সদস্য নির্বাচন করে। মাধ্যমিক নির্বাচনী সংস্থার সদস্যগণ পর্যায়ক্রমে চূড়ান্ত প্রতিনিধি নির্বাচন করে থাকে। জনগণের ভোটদানের অধিকার একটি পবিত্র রাজনৈতিক অধিকার। তবে ভোটদানের পদ্ধতির উপর ভোটাধিকারের পবিত্রতা ও তাৎপর্য নির্ভর করে। ভোটদান পদ্ধতি প্রকাশ্য বা গোপন হতে পারে। প্রকাশ্য ভোটদান "ধ্বনি" দিয়ে বা "হাত তুলে" হয়ে থাকে। গোপন ভোটদান পদ্ধতিতে জনসাধারণ গোপনে ব্যালট পেপারের মাধ্যমে প্রার্থী নির্বাচন করে থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন– ৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১। প্রত্যক্ষ নির্বাচন কাকে বলে ?
- ক. যে নির্বাচন পদ্ধতিতে জনসাধারণ মাধ্যমিক নির্বাচনী সংস্থার মাধ্যমে প্রতিনিধি নির্বাচন করে
- খ. যে নির্বাচন ব্যবস্থায় ভোটারগণ ভোট দিয়ে সরাসরি প্রতিনিধি নির্বাচন করে
- গ. যেখানে ভোটারগণ দলীয় মনোভাবের ভিত্তিতে নির্বাচনী সংস্থার সদস্যদের নির্বাচন করে
- ঘ. যারা অভিজ্ঞ শিক্ষিত রাজনৈতিক সচেতন ব্যক্তি কেবল তারাই প্রতিনিধি নির্বাচন করে

২। নিচের কোনটি পরোক্ষ নির্বাচনের গুণ ?
- ক. রাজনৈতিক শিক্ষা ও সচেতনতা বৃদ্ধি
- খ. দুর্নীতির সহায়ক নয়
- গ. অসার ও অযৌক্তিক নয়
- ঘ. উপযুক্ত প্রতিনিধি নির্বাচিত করার সুবিধা

পাঠ ৪ : যুক্তনির্বাচন, পৃথক নির্বাচন, প্রতিনিধিত্বের প্রকারভেদ ও বিভিন্ন ধরনের প্রতিনিধিত্বের দোষ-গুণ

উদ্দেশ্য : এই পাঠ শেষে আপনি–

- যুক্ত নির্বাচন ও পৃথক নির্বাচনের মধ্যকার পার্থক্য সনাক্ত ও বর্ণনা করতে পারবেন।
- আঞ্চলিক প্রতিনিধিত্ব, পেশাগত প্রতিনিধিত্ব, সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব এবং বিভিন্ন ধরনের প্রতিনিধিত্বের দোষ-গুণসমূহ লিখতে ও বলতে পারবেন।

২০.৪.১ যুক্ত নির্বাচন ও পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা

(ক) যুক্ত নির্বাচন– যে নির্বাচন ব্যবস্থায় সম্প্রদায় ও গোষ্ঠী নির্বিশেষে সকল নাগরিক সম্মিলিতভাবে ভোট দিয়ে আইনসভার প্রতিনিধি নির্বাচন করে, তাকে যুক্ত নির্বাচন ব্যবস্থা বলা হয়। এ নির্বাচন ব্যবস্থায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দল থাকতে পারে। কিন্তু এতে জনসাধারণ সম্প্রদায়গতভাবে বিভক্ত না হয়ে দলগতভাবে বিভক্ত হয়ে ভোট দিয়ে প্রতিনিধি নির্বাচন করতে পারে।

(খ) পৃথক নির্বাচন– পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থায় আসনগুলো প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক করে দেওয়া হয়। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের সদস্যবৃন্দ ভোট দিয়ে আইনসভায় নিজেদের জন্য নির্ধারিত আসনগুলো পূরণ করে। এরূপ নির্বাচন ব্যবস্থায় মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান সম্প্রদায়গুলোর আসন নির্ধারিত থাকে এবং প্রত্যেক সম্প্রদায় স্বীয় আসনগুলোর জন্য প্রতিনিধি নির্বাচন করে থাকে।

২০.৪.২ প্রতিনিধিত্বের প্রকারভেদ

(ক) আঞ্চলিক প্রতিনিধিত্ব– এ ব্যবস্থায় প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য দেশের সমগ্র ভূ-ভাগকে বিভিন্ন নির্বাচনী এলাকায় বিভক্ত করা হয়। প্রতি অঞ্চলের জন্য প্রতিনিধি নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়। অঞ্চল ভিত্তিতে যখন প্রতিনিধি নির্বাচন করা হয় তখন তাকে আঞ্চলিক প্রতিনিধিত্ব বলা হয়। বাংলাদেশসহ বিশ্বের অনেক দেশে আঞ্চলিক প্রতিনিধিত্ব রয়েছে।

(খ) পেশাগত প্রতিনিধিত্ব– কেউ কেউ মনে করেন, আঞ্চলিক প্রতিনিধিত্ব গ্রহণযোগ্য নয়। তাঁদের মতে, প্রতিনিধিগণ কোন বিশেষ অঞ্চলের প্রতিনিধিত্ব করতে পারেন না। কারণ এ ধরনের ভৌগোলিক অঞ্চলে প্রতিনিধিত্বের প্রয়োজন নেই। বৃত্তিগতভাবে বা পেশাগতভাবে বিশেষ বিশেষ গোষ্ঠির জন্য আলাদা আলাদা প্রতিনিধি নির্বাচনের ব্যবস্থা করা উচিত।

(গ) সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব– এই পদ্ধতিতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভোটাধিকারের সংখ্যা অনুপাতে প্রতিনিধির সংখ্যা নির্ধারণ করা হয়। যেমন– সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভোটারের সংখ্যা যদি মোট ভোটার সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ হয় তাহলে মোট প্রতিনিধির এক-তৃতীয়াংশ সংখ্যালঘু প্রতিনিধির আসন পাবে। জার্মানী, বেলজিয়াম, নরওয়ে, সুইডেন প্রভৃতি দেশে এই ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব ব্যবস্থায় এই অনুপাতে ভোট গ্রহণ করা হয়।

২০.৪.৩ বিভিন্ন ধরনের প্রতিনিধিত্বের দোষ-গুণ

আঞ্চলিক প্রতিনিধিত্ব যেকোনো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জন্য আবশ্যক। প্রত্যেকটি এলাকা থেকে প্রতিনিধি নির্বাচিত হলে জনগণ উক্ত প্রতিনিধির মাধ্যমে তাদের সমস্যাবলী সরকারকে জানাতে পারে। কিন্তু আঞ্চলিক প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রেও কিছু ত্রুটি দেখা যায়। এখানে সংখ্যালঘুদের স্বার্থ সংরক্ষণ করা যায় না। তাদের মতামত প্রকাশের তেমন কোন সুযোগ থাকে না। তাছাড়া একই অঞ্চলের ভোটারগণের স্বার্থ সাধারণত এক হয় না। ফলে প্রতিনিধিগণ ব্যক্তিগত মতামত ছাড়া প্রতিনিধিত্বের উপর তেমন গুরুত্ব দেয় না।

উপরিউক্ত কারণে বর্তমানকালের অনেক পণ্ডিত বৃত্তিমূলক প্রতিনিধিত্বের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁদের মতে পেশাগত বা বৃত্তিমূলকভাবে বিশেষ বিশেষ গোষ্ঠির জন্য আলাদা প্রতিনিধি নির্বাচনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

তবে বৃত্তি বা পেশার ভিত্তিতে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে আইন পরিষদ গঠিত হলে আইন সভা বিভিন্ন শ্রেণি বা গোষ্ঠির স্বার্থপরতার ক্ষেত্রে পরিণত হতে পারে। এক্ষেত্রে সকলে জাতীয় উন্নতির কথা চিন্তা না করে নিজ নিজ পেশা বা শ্রেণির লোকের উন্নয়নের কথা চিন্তা করবে। প্রতিটি গোষ্ঠি থেকে এ ধরনের প্রতিনিধি নিয়ে কোন স্থায়ী সরকার গঠন করা সম্ভব হবে না। এ ক্ষেত্রে দেশে কোন সুসংগঠিত রাজনৈতিক চিন্তার বিকাশ ঘটবে না, কোন সুসংগঠিত রাজনৈতিক দল গড়ে উঠবে না। বিভিন্ন গোষ্ঠী তাদের নিজ নিজ স্বার্থ সংরক্ষণের চেষ্টা করবে কিন্তু কোন একক শক্তি হিসেবে কাজ করতে সক্ষম হবে না।

কেউ কেউ মনে করেন, আঞ্চলিক প্রতিনিধিত্ব ও পেশাগত প্রতিনিধিত্ব এ দুটি ব্যবস্থার সংমিশ্রণে যদি আইনসভা গঠিত হয় তাহলে বেশ ভাল হয়। লাস্কি এ মতামত স্বীকার করেন। গ্রাহাম ওয়ালাস-এর মতে, আইনসভার প্রথম কক্ষ আঞ্চলিক ভিত্তিতে কিন্তু দ্বিতীয় কক্ষ বৃত্তি ও পেশার ভিত্তিতে গঠিত হওয়া আবশ্যক।

সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব বর্তমানকালে খুবই গ্রহণযোগ্য। এতে সংখ্যালঘুরা তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করার সুযোগ পায়। প্রত্যেক ভোটার তার ভোট যেকোনো একজনকে বা ভাগাভাগি করে দিতে পারে। ভোট দেওয়ার পর গণনা করে যে তালিকায় যত ভোট পায় তার অনুপাত অনুসারে তালিকার উপর দিক থেকে প্রতিনিধি গ্রহণ করা হয়। ফলে দলীয় ভিত্তিতে সংখ্যালঘু প্রতিনিধি নির্বাচিত হতে পারে। তবে সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় সমস্যা যেটা দেখা যায় তা হল, সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় এতে ক্ষুদ্ধ হয়। কারণ এতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় শক্তিশালী হয় এবং তারা মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। ফলে দেশের নেতৃত্বের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সমস্যা দেখা দেয়।

সার-সংক্ষেপ

নির্বাচনকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন, যুক্ত নির্বাচন ও পৃথক নির্বাচন। যুক্ত নির্বাচনে দেশের সকল সম্প্রদায় ও গোষ্ঠী নির্বিশেষে সকল নাগরিক অংশগ্রহণ করতে পারে। কিন্তু পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থায় আসনগুলো প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক করা হয়। প্রতিনিধিত্বের দিক দিয়ে নির্বাচনকে আঞ্চলিক প্রতিনিধিত্ব, পেশাগত প্রতিনিধিত্ব, সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব প্রভৃতি ভাগে ভাগ করা যায়। আঞ্চলিক প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে দেশের সমগ্র ভূ-ভাগকে বিভিন্ন নির্বাচনী অঞ্চলে ভাগ করে নির্বাচনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়। বাংলাদেশসহ পৃথিবীর অনেক দেশে এ ব্যবস্থা চালু আছে। পেশাগত প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে বিভিন্ন পেশার ভিত্তিতে প্রতিনিধি নির্বাচন করা হয়। সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে বিভিন্ন গোষ্ঠি বা সম্প্রদায়ের জনসংখ্যার হার অনুপাতে প্রতিনিধি নির্বাচন করার বিধান থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন– ৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। কোন নির্বাচনকে যুক্ত নির্বাচন বলে ?
- ক. সম্প্রদায়ের ভোটারের সংখ্যা অনুপাতে প্রতিনিধির সংখ্যা নির্ধারণ করা হলে
- খ. সম্প্রদায় ও গোষ্ঠী নির্বিশেষে সকলে সম্মিলিতভাবে প্রতিনিধি নির্বাচন করলে
- গ. পেশাগতভাবে কোন বিশেষ গোষ্ঠীর জন্য আলাদা প্রতিনিধি নির্বাচনের ব্যবস্থা করলে
- ঘ. কোন নির্বাচন ব্যবস্থায় সারা দেশে অঞ্চল ভিত্তিক নির্বাচন করা হলে

২। কোন পদ্ধতিতে সংখ্যালঘুরা তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করার সুযোগ পায় ?
- ক. আঞ্চলিক প্রতিনিধিত্ব
- খ. পেশাগত প্রতিনিধিত্ব
- গ. সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব
- ঘ. সম্পত্তিভিত্তিক প্রতিনিধিত্ব

পাঠ ৫ : উত্তম নির্বাচন– নির্বাচন কমিশন, সরকার, বিরোধী দল, বিচারালয়, ভোটার ও জনগণের দায়-দায়িত্ব, বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থা, নির্বাচন কমিশন ও সুষ্ঠু নির্বাচনের সমস্যা

উদ্দেশ্য : এই পাঠ শেষে আপনি–

- নির্বাচন কমিশনের দায়-দায়িত্ব লিখতে পারবেন।
- সরকারের দায়-দায়িত্ব ও বিরোধী দলের দায়-দায়িত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।
- বিচারালয়ের দায়-দায়িত্ব, ভোটার ও জনগণের দায়-দায়িত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থা, নির্বাচন কমিশন ও সুষ্ঠু নির্বাচনের সমস্যা লিখতে পারবেন।

২০.৫.১ নির্বাচন কমিশনের দায়-দায়িত্ব

আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নির্বাচনের গুরুত্ব অপরিসীম। নির্বাচন পরিচালনার জন্য বাংলাদেশের সংবিধানে একটি নির্বাচন কমিশন গঠনের বিধান রয়েছে। এ নির্বাচন কমিশন সর্বপ্রকার নির্বাচন পরিচালনা করে থাকে। নির্বাচন কমিশনের দায়-দায়িত্ব নিম্নে বর্ণিত হল :

(১) ভোটার তালিকা প্রণয়ন।
(২) সংসদ নির্বাচনের জন্য এলাকার সীমানা নির্ধারণ।
(৩) সঠিক ও নিরপেক্ষ নির্বাচন পরিচালনার জন্য রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ।
(৪) প্রেসিডেন্ট ও সংসদ সদস্যদের নির্বাচনের জন্য মনোনয়নপত্র গ্রহণ ও বাছাই এবং বাছাইকৃত মনোনয়নপত্র সংক্রান্ত জটিলতা নিরসন।
(৫) জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠান।
(৬) প্রেসিডেন্ট পদের নির্বাচন অনুষ্ঠান পরিচালনা।
(৭) সকল নির্বাচনের চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণা।
(৮) নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু নির্বাচন পরিচালনা।

২০.৫.২ সরকারের দায়-দায়িত্ব

সরকার হচ্ছে একটি রাষ্ট্রের অন্যতম এবং অপরিহার্য উপাদান। সরকারের মাধ্যমে জনগণ তাদের অধিকারসমূহ ভোগ করে থাকে। অপরদিকে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ভোটাধিকার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধিকার। ভোটাধিকার হচ্ছে জনগণের রাজনৈতিক অধিকার। নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণ তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করে থাকে। নির্বাচন কমিশন তার সাংবিধানিক ক্ষমতা বলে এই রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করার পথ করে দেয়। সরকার এ ব্যাপারে সহায়তা দান করে। কারণ নির্বাচন কমিশনের ব্যর্থতার দায়-দায়িত্ব সরকারকেই বহন করতে হয়। সরকারের নির্বাচন সংক্রান্ত দায়-দায়িত্ব নিম্নে আলোচনা করা হল :

(১) নির্বাচন কমিশন কর্তৃক পরিচালিত সকল প্রকার নির্বাচনে সার্বিক সহায়তা দান।
(২) বিভিন্ন প্রকার নির্বাচন, যেমন– সংসদ নির্বাচন, রাষ্ট্রপতি নির্বাচন, উপজেলা নির্বাচন, পৌরসভা নির্বাচন, ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন ইত্যাদি যেকোনো ধরনের নির্বাচনের ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নির্বাচনী তফসিল ঘোষণায় সহায়তা দান।
(৩) নির্বাচন কমিশন কর্তৃক পরিচালিত ভোটার তালিকা প্রণয়নে সহায়তা দান।
(৪) নির্বাচনকালে নির্বাচনের নিরপেক্ষতা বজায় রাখার জন্য নির্বাচন কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।
(৫) নির্বাচনী এলাকার শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য আইনানুগ পদক্ষেপ গ্রহণ।
(৬) নির্বাচন যাতে সুষ্ঠু হয়, কোনরকম কারচুপি অথবা কোন দলীয় প্রার্থীর দৌরাত্ম্যবৃদ্ধি না পায়, সেদিকে প্রশাসন ও নির্বাচন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদেরকে সজাগ দৃষ্টি রাখার জন্য নির্দেশ প্রদান।
(৭) দেশে যাতে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তার জন্য সার্বিক ব্যবস্থা গ্রহণ।

(৮) সর্বোপরি নির্বাচন কমিশন যাতে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন পরিচালনা করতে পারে তার জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা।

২০.৫.৩ বিরোধী দলের ভূমিকা

নির্বাচন ব্যবস্থা এবং সরকারি দলের ভূমিকার সাথে বিরোধী দলের ভূমিকা গভীরভাবে জড়িত। রাষ্ট্রে যে দল সরকার পরিচালনা করে তাকে সরকারি দল বলে। অন্যদিকে, অন্য যে দলগুলো রাষ্ট্র পরিচালনায় সরাসরি অংশগ্রহণ না করে সরকারের গঠনমূলক সমালোচনা করে তাদেরকে বিরোধীদল বলে। একটি দেশের বিরোধী দল নির্বাচনের পদ্ধতি, রাজনৈতিকদল গঠন এবং কার্যকলাপ পরিচালনার পদ্ধতিকে প্রভাবিত করে। বিরোধীদল নির্বাচন ব্যবস্থায় বিভিন্ন শ্রেণির প্রতিনিধিত্ব করে। কোন রাষ্ট্রে নির্দিষ্ট সময় অন্তর যাতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, তার ক্ষেত্রে বিরোধী দল সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। বিরোধী দলই নির্বাচনী রাজনীতির প্রাণকেন্দ্র। বর্তমান কালে প্রত্যেক রাষ্ট্রে বেশির ভাগ নির্বাচন প্রার্থীই কোন না কোন দলের দ্বারা মনোনীত হন। বিরোধীদল রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার অন্যতম প্রধান শক্তিশালী এবং প্রভাবশালী হাতিয়ার। নির্বাচনের সময়ে বিরোধী দল সুষ্ঠু জনমত গঠনে সহায়তা করে থাকে। ভবিষ্যতে ক্ষমতা লাভের আশায় বিরোধী দল জনগণের আশা–আকাঙ্ক্ষার সাথে সঙ্গতি রেখে নীতি ও কর্মসূচি প্রণয়ন করে। উদারনৈতিক গণতন্ত্রে বিরোধী দলই বিকল্প সরকার। কারণ, নির্বাচনে জয়লাভ করলে বিরোধী দল ক্ষমতা লাভের বা সরকার গঠনের সুযোগ পায়। ফলে শান্তিপূর্ণ উপায়ে সরকার পরিবর্তনের পথ প্রশস্ত হয়।

২০.৫.৪ বিচারালয়ের দায়-দায়িত্ব

যদি নির্বাচনকালে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে কোন মামলা দায়ের করা হয়, বিচার বিভাগ সেই মামলার ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে পারে। নির্বাচনের সময় নির্বাচনকে কেন্দ্র করে অনেক প্রভাবশালী ব্যক্তি জড়িত হয়ে পড়েন। এ ক্ষেত্রে যত শক্তিশালী বা প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ হোক না কেন বিচার বিভাগকে সব সময় সৎ ও নিরপেক্ষ থাকতে হবে যাতে বিচারের বাণী নিরবে নিভৃতে না কাঁদে। মানুষ সব সময় ন্যায়বিচারের জন্য বিচার বিভাগের কাছে যায়। কাজেই বিচারকগণকে নিরপেক্ষ দৃষ্টি দিয়ে বাদী বিবাদীর সমস্ত কথা শুনে, তথ্য সংগ্রহ করে, ন্যায়নীতির ভিত্তিতে শান্তভাবে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যাতে মামলার রায় সঠিক হয়। আর এভাবে যদি ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা যায়, তাহলেই কেবল দেশে অবাধ, সুষ্ঠু ও উত্তম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। কাজেই দেখা যাচ্ছে, নির্বাচনকে কেন্দ্র করে যে সমস্ত মামলা বা জটিলতা সৃষ্টি হয় তার সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ বিচার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উত্তম নির্বাচন নিশ্চিত করার ব্যাপারে বিচারালয়ের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

২০.৫.৫ ভোটার ও জনগণের দায়-দায়িত্ব

একটি দেশে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন সে দেশের জনগণের উপর নির্ভরশীল। ভোটাররা জনগণেরই অংশ। প্রার্থী নির্বাচনের ক্ষেত্রে ভোটারদের দায়িত্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কোন প্রকার প্রলোভনের বশবর্তী না হয়ে ভোটাররা যাতে যোগ্য প্রার্থীকে ভোট দিতে পারে সেদিকে সকলের লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন।

নির্বাচনের পবিত্রতা রক্ষা করা প্রত্যেক নাগরিকের দায়িত্ব। দেশের জনগণ নির্বাচনের প্রাক্কালে নির্বাচন যাতে সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে হয় সেদিকে লক্ষ রাখবে এবং ভোটার তালিকা প্রণয়নে সহযোগিতা করবে। দেশের সব প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি যাতে ভোটার হন সেদিকে নির্বাচন কমিশনের সাথে সাথে জনগণেরও লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। নির্বাচনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নির্বাচনের যাবতীয় কাজে সাহায্য করা জনগণের কর্তব্য। একটি দেশের ভোটার ও জনগণই পারে উত্তম নির্বাচনব্যবস্থা নিশ্চিত করতে। অর্থাৎ একটি দেশে নির্বাচনকালে যদি ভোটার ও জনগণ সার্বিক সহযোগিতা করে তাহলেই উত্তম নির্বাচনব্যবস্থা নিশ্চিত করা যাবে।

সার-সংক্ষেপ

নির্বাচন কমিশনের সততা, নিরপেক্ষতা ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের উপর উত্তম নির্বাচন অনেকাংশে নির্ভরশীল। নির্বাচন কমিশন নির্বাচনী তফসিল ঘোষণা, ভোটার তালিকা প্রণয়ন, রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ, মনোনয়নপত্র গ্রহণ, বাছাই, নির্বাচন পরিচালনা, ফলাফল ঘোষণা প্রভৃতি কার্যাবলী সম্পাদন করে থাকে। সরকারকে নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা করতে হবে। কারণ নির্বাচন কমিশনের ব্যর্থতার দায়-দায়িত্ব সরকারকেই বহন করতে হয়। বিরোধী দল নির্বাচনের পূর্বে ও নির্বাচনকালে সহযোগিতা না করলে সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন কার্য পরিচালনা করা সম্ভব হয় না। নির্বাচনকে কেন্দ্র করে যদি কোন মামলা দায়ের করা হয় সে ক্ষেত্রে বিচার বিভাগ প্রধান ভূমিকা পালন করে। যাতে সঠিকভাবে ন্যায়-নীতির ভিত্তিতে নির্বাচনে সৃষ্ট মামলা ও সমস্যার সমাধান হয় সেদিকে বিচারালয় খেয়াল রাখে। নির্বাচন যাতে সুষ্ঠুভাবে হয়, নির্বাচনের প্রাক্কালে যাতে কোন অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা না ঘটে, সেদিকে ভোটার ও জনগণকে খেয়াল রাখতে হয়। একমাত্র জনগণই পারে উত্তম নির্বাচন ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে। এভাবে সকলের পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে দেশের নির্বাচন ব্যবস্থা কার্যকর হলেই উত্তম নির্বাচন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন– ৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১। নির্বাচনের সময় ভোটারদের দায়িত্ব কি ?
ক. শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখা
খ. যোগ্য প্রার্থীকে ভোট দেওয়া
গ. নির্বাচনের পবিত্রতা রক্ষা করা
ঘ. গোলমাল না করা

২। নির্বাচন পরিচালনায় ব্যর্থতার দায়-দায়িত্ব কাকে বহন করতে হয় ?
ক. নেতৃত্ব ও কর্মীকে
খ. ভোটার ও জনগণকে
গ. বিচারালয়কে
ঘ. সরকারকে

৩। বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থা কোন পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হয় ?
ক. প্রকাশ্য ব্যালটে
খ. গোপন ব্যালটে
গ. মৌখিক ভাবে
ঘ. লিখিত ভাবে

অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। নির্বাচন কাকে বলে ? –২০.১.১
২। নির্বাচন কমিশন কি ? –২০.১.৩
৩। নির্বাচকমণ্ডলী কাকে বলে ? –২০.২.১
৪। নারী ভোটাধিকার বলতে কি বুঝায় ? –২০.২.৬
৫। প্রত্যক্ষ নির্বাচন কাকে বলে ? –২০.৩.১
৬। প্রকাশ্য ভোট দান কাকে বলে ? –২০.৩.৫(ক)
৭। পৃথক নির্বাচন কাকে বলে ? –২০.৪.১(খ)
৮। যুক্ত নির্বাচন কাকে বলে ? –২০.৪.১ (ক)
৯। উত্তম নির্বাচন ব্যবস্থার শর্তাদি লিখুন। –২০.৫.৩
১০। নির্বাচনে বিরোধী দলের দায়-দায়িত্ব লিখুন। –২০.৬.৩
১১। নির্বাচনে সরকারের দায়-দায়িত্ব লিখুন। –২০.৬.২

রচনামূলক প্রশ্ন

১। নির্বাচকমণ্ডলী কাকে বলে ? গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নির্বাচকমন্ডলীর কার্যাবলী আলোচনা করুন। –২০.২.১ ও ২০.২.২

২। সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকার বলতে কি বুঝায় ? সার্বজনীন ভোটাধিকারের পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তিগুলো কি কি ? –২০.২.৭

৩। প্রত্যক্ষ নির্বাচনের দোষ ও গুণ আলোচনা করুন। –২০.৩.৩

৪। পেশাগত প্রতিনিধিত্ব কাকে বলে ? বিভিন্ন প্রকার প্রতিনিধিত্বের দোষ-গুণ আলোচনা করুন। –২০.৪.২(ক) ও ২০.৪.৩

৫। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনপ্রতিনিধিত্বের উপর নির্বাচকমন্ডলীর নিয়ন্ত্রণ আরোপের পন্থা আলোচনা করুন। –২০.৫.২

৬। নির্বাচন কমিশন কাকে বলে? সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা কি হওয়া উচিত। –২০.১.৩ ও ২০.৬.১

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন– ১ ঃ ১। গ, ২। খ, ৩। গ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন– ২ ঃ ১। ঘ, ২। ক, ৩। ঘ

পাঠোত্তর মূল্যাযন– ৩ ঃ ১। খ, ২। ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন– ৪ ঃ ১। খ, ২। গ

পাঠোত্তর মূল্যাযন– ৫ ঃ ১। খ, ২। ঘ, ৩। খ